

নজরুলের চিঠিপত্র

শহীদ ইকবাল

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী'র^১ পঞ্চম খণ্ডের (দ্বিতীয়ার্ধে) নজরুলের চৌষট্টিটি চিঠি সংকলিত হয়েছে। নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) এর অপ্রকাশিত অনেক চিঠিও রয়েছে, অনেকগুলো এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে শাহাবুদ্দীন আহমেদের সম্পাদনায় 'নজরুলের পত্রাবলী'^২ বের হয়েছে। সাতাত্তরটি চিঠির সংকলন এতে রয়েছে। সম্পাদক গ্রন্থটির ভূমিকায় হারিয়ে যাওয়া পত্রাবলীর প্রতি খেদেতি করেছেন এবং এও বলেছেন এগুলো না পেলে নজরুল জীবনী রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইতিমধ্যে নানা প্রত্নপত্রিকায় নজরুলের অনেক অজ্ঞাত রচনার সাক্ষাৎ মিলেছে। ছিটেফোঁটা হলেও সেগুলো থেকে নজরুল গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত হবে। নজরুল সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য বেরিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই। নজরুল এবং তাঁর চিঠিপত্র বিষয়ক আলোচনার এ ক্ষেত্রে আমরা উল্লিখিত আবদুল কাদিরের গ্রন্থটির শরণাপন্ন হব। এখানে গ্রথিত চিঠিপত্রগুলো, একজন নজরুলের লেখক 'হয়ে ওঠা'র ব্যাপারটায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কতটুকু এবং কিভাবে জড়িত তার একটা প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। বাউন্ডেলে নজরুল ব্যক্তিজীবনে কোনো ডায়েরী লেখেননি আত্মজীবনীমূলক বা স্মৃতিচারণমূলক কোনো রচনার প্রতিও দৃষ্টি দেননি। তাঁর স্বল্পায়ু সাহিত্য জীবনে নিজস্ব পরিমণ্ডলের কিছু মানুষের সাথে যোগসূত্রের তাগিদে চিঠিপত্রে মতবিনিময় করেছেন। কখনো দুঃসহতায় অব্যক্ত মনের কখন চিঠিতে ব্যক্ত করে ভারমুক্ত হয়েছেন। নানাপর্যায়ের এসব লেখনীর মধ্যে কবি নজরুল, দুঃখ দারিদ্র্যক্লিষ্ট নজরুল, প্রেমিক ও মানবতাবাদী নজরুল সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে। চিঠিপত্র তাঁর কল্পনাশক্তিতে সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে, কবির দায়বোধে তিনি হয়েছেন সমাজের অঙ্গীকারে ঋদ্ধ-শৃঙ্খলভাঙ্গার প্রতীক। প্রত্যেকটি পত্রে তাঁর অন্তর্নিহিত তেজ উত্তাপ ছড়িয়েছে। এক্ষেত্রে কবির পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যজীবনের নানা পর্বের উত্থান-পতন চিঠিপত্রগুলোর আধারে মূল্যায়নের প্রয়াস পাওয়া যাবে।

নজরুল প্রতিভার অসামান্য স্ফূরণ তাঁর চিঠিপত্রগুলো। 'বাঁধন-হারা'^৩ পত্রোপন্যাস এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। নজরুলের সংকলিত চিঠিপত্রগুলোর সময়কাল ১৯১৯ থেকে ১৯৪২ অবধি। মূলত এ সময়টাই তাঁর সাহিত্যচর্চার কাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ চিঠিপত্রের অংশে নজরুলের অভিভাষণও যুক্ত রয়েছে। কলাকৈবল্যবাদীদের ধারায় নজরুল কখনো সাহিত্যচর্চা করেননি, জীবনের জন্যই শিল্পকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। সমাজের

সাহিত্যিকী

দায়বোধ, আত্মসমালোচনা, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ সর্বোপরি ব্যক্তি নজরুলের সাথে ধর্মকে জড়িয়ে মৌলবাদীদের যে তাড়ব- এসব নজরুলের মনে দারুণ পীড়া দেয়। পত্রাবলীতে নিজের অন্তরজ্বালার আক্ষেপ, আবেগের প্রাঞ্জল আচ্ছন্নতার কলোক্ষনি এতে সুস্পষ্ট। অসাধারণ কল্পনাশক্তির মাঝে তার আবেগ সমকালের ঘটনাকে ভিন্ন অর্থারোপিত করেছে। শেষাবধি তা শিল্পমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কবি বলেছেন 'আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মত, হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিশ্বয় থাকবে না বেশীদিন। ধূমকেতু যেমন সহসা আসে তেমনি সহসা চলে যায়। তোমরা আমাদের আকাশের অনাগত জ্যোতিষ্ক, গ্রহাণুপুঞ্জ; তোমরা যেদিন রূপ ধরে উঠবে, সেদিন তোমাদের আড়াল করে থাকার কোন প্রয়োজন হবে না এ ধূমকেতুর। আমার সমস্ত লেখায় কামনায় শুধু এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে- তোমরা এসো অনাগত কবির দল, আমি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমরা ভোরের পাখি, তাদের গান শুনোয়।'^৪ আজিজুল হাকিমকে লিখিত পত্রে ঐ অনাগত দিনগুলোর প্রতি তাঁর আশাবাদ। প্রজন্মকে সাহসী হবার পথে প্রেরণা দিচ্ছেন, শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্য প্রণোদিত করছেন। এক্ষেত্রে স্বদেশ ও স্বভূমির প্রতিও অঙ্গীকার-

আজাদী অনাগত তারই আগমনী গাওয়া ও তা হাসিল করাই বিপ্লবীদের প্রাণের লক্ষ্য। আপনারা লক্ষ্যপথ ধরে যাত্রা করুন। কোন বিষয়ই সে পথে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। দেশ গোলামীর জিম্মির হয়ে মুক্ত হোক! মুক্ত প্রাণে, মুক্ত বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারব, সেই দিন হবে আমার অভিযানের শেষ। আপনারা জন কয়েক তরুণ আমার সহযাত্রী হচ্ছেন, এজন্য আমি একান্ত আশান্বিত। আজ যদিও চারিদিকে বিপ্লবের বিজীমিকা - আনন্দের অকৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে- তবুও পিছপা হবার কিছু নেই। প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য ত্যাগ ও সাধনার মূল্য একদিন সমাজ দেবেই।^৫

সাহিত্য সাধনার প্রথম থেকেই নজরুল শৃঙ্খলমুক্তির কথা বলেছেন, মানবতার মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। শ্রেণীশাসক চিহ্নিত করে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সকলকে জাগিয়েছেন; দারুণ প্রাণশক্তি নিয়ে প্রভঞ্জন উল্লাসে মেতেছেন- কোনো সময় সে তেজ স্তিমিত হয়নি। মাটি ও মানুষের সাথে নজরুলের আত্মার বন্ধন ছিল, কৃষককুলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। সাম্যবাদের চেতনায় তাঁর মূর্ত অঙ্গীকার 'আজ কৃষকের দুঃখ শ্রমিকের কাত্রানীতে আল্লার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। দিন আসিয়াছে, বহু যন্ত্রণা পাইয়াছ ভাই- এইবার তাহার প্রতিকারের ফেরেশতা, দেবতা আসিতেছেন।'^৬ নজরুলের এমন উদ্দীপনার ক্ষেত্র নানাভাবে এ সময়ের মানুষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। আলোচনা সমালোচনার ডেউ কূল ছাপিয়ে দিয়েছে, তবু দমনেনি এতটুকু। 'কখনো দরিদ্র তাঁর দুয়ারে ধরে অনবরত কেঁদেছে পুত্র হয়ে জায়া

নজরুলের চিঠিপত্র

হয়ে, কখনো হিন্দুরা তাঁকে গাল দিয়েছে প্রমীলাকে বিয়ে করার জন্য। তাঁর কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারের জন্য আর মুসলমানরা তাঁকে তিরস্কার করেছেন তাঁর কবিতায় দেব দেবীর উপস্থিতির জন্য, ফতোয়া দিয়েছেন তাঁকে কাকের বলে। কবিরবন্ধুরা অনেক সময় হতাশ হয়ে বলেছেন যে তাঁর লেখায় বড্ড বেশী রাজনীতি, চিরকালীন বাণী নেই সেখানে। আবার রাজনীতির অঙ্গনের এক পক্ষ বলেছেন যে তিনি 'ভায়োলেসের ভায়োলিন' বাজান, বড্ড বেশী বিপ্লবী তিনি। আবার অন্য পক্ষ বলেছেন যে তিনি অহিংসবাদী, নইলে চরকার গান বাঁধবেন কেন? যারা মধ্যপন্থী ডোমেনিয়ান স্টেটাস এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছেন, তাঁরাও অশুশী, কারণ কবি তাঁদের সমর্থন করতে পারছেন না। আর বৃটিশরাজ তো ক্ষেপেই আছে তার বিরুদ্ধে-^৭ এতো কিছু মাঝে দমেননি তিনি। কবিরবন্ধুদের টেনে এনেছেন, ভক্তদের কাজে লাগিয়েছেন- নিজে তৎপর থেকেছেন। সামাজিক আন্দোলনে, রাজনীতিতে, সাংবাদিকতায় সাম্রাজ্যবাদের পেছনে তটস্থ থেকে ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়েছেন সবাইকে। নলীনিকান্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, শৈলজানন্দ, প্রেমেন মিত্র, অচিন্ত্যকুমার হরিহর আত্মা একত্রিত হয়ে ঝড় তুলল স্বদেশী আন্দোলনের জগতে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখছেন, নজরুল বললে, "ধুমকেতু" নামে এক সাপ্তাহিক বের করছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমি মহাকালের তৃতীয় নয়ন, আপনি ত্রিশূল! আসুন দেশের ঘুম ভাঙাই, ভয় ভাঙাই- নৃপেন উৎসাহে ফুটে লাগল।^৮ একইভাবে 'লাঙল'(১৯২৫) বের করতে গিয়ে মুরলীধর বসুকে এক পত্রে নজরুল লিখছেন 'তোমাকে লিখতে হবে কিন্তু লাঙলে'। প্রথমবারই দিতে হবে। সকলে মিলে কাঁধ দেওয়া থাক।... শৈলজা, প্রেমেন, অচিন্ত্যকে তাড়া দিও লেখার জন্য।^৯ দোদাঁড় প্রতাপে লেখা চলল। রবীন্দ্রনাথ আশির্বানী পাঠালেন অগ্নিবীণায় নৃপেন কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে লিখলেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, নজরুল কারার কপাট ভাঙার গান লিখলেন। ছল্লোড় পড়ল সারা বাংলায়। নজরুল পত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন, অন্য পত্রিকায় লিখেছেন, বন্ধুদের লিখতে বলেছেন। সেই সাথে ঘুম ভাঙানোর কথা বলেছেন। দেশ জাতির প্রতি দায়বোধ এবং সে সম্পর্কে তাদের কর্তব্য, সচেতনতাবোধ জন্মিয়েছেন তিনি। পত্রাবলীর মাধ্যমে তাদের যোগাযোগের সূত্র এটাই। নিজস্ব চোখে আবেগধর্মী মন্ত্রে নিজের দায়িত্ব এবং অবস্থান সম্পর্কে কথা বলেছেন নজরুল। প্রথম চিঠিতে ১৯১৯ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখে নজরুল লেখক হয়ে উঠছেন- লেখার প্রতি তাঁর যত্ন অসাধারণ। সাথে ব্যক্তি জীবনের ফর্দিও আছে। এখন তিনি সৈনিক; সৈনিকের Undisturbed time নেই। সৈনিকের জীবন বড্ড কষ্টের জীবন। আর তার চেয়ে হাজার পরিশ্রম করে একটু

সাহিত্যিকী

আধটু লেখি।^{১০} হৃদয়ের কষ্ট থেকে লিখেছেন নজরুল আর অর্থকষ্টের জন্য হাত পাতিয়েছেন পত্রিকার সম্পাদকদের নিকট, রাজনৈতিক সহকর্মী বন্ধুদের নিকট। 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনকে লিখেছেন নজরুল- 'সওগাত হতে কিছু নিতে আমার কষ্ট হয়। আপনি এটা ঋণ দিচ্ছেন মনে করে দিবেন। আমার বইয়ের দাম হতে এটা কেটে নেবেন। আমি হয়ত এক সপ্তাহের মধ্যেই বা পরেই কলকাতা যাব ইনশাআল্লাহ। যদি আপনার কষ্ট না হয়, তা হলে গোটা বিশেক টাকা পাঠালে বড় উপকৃত হতুম। গোপালদা একশ' টাকার সব টাকা দেননি। চিঠি লিখে উত্তর পাইনি। ও - টাকাটা এলে আপনাকে বিব্রত করতাম না লিখে। গোপালদাকে কিছু বলবেন না যেন। এখানেও তাই অনেক ঋণ হয়ে গেছিল - টাকা পেলেই কিছু কিছু করে তার শোধ দিতে হয়। অন্য পাবলিশারের কাছেও টাকা পাচ্ছিলে চিঠি লিখে, লেখার দামও পাচ্ছিলে - যেখানে যেখানে পাবার কথা। আপনাকে আমি অসংকোচে সব কথা লিখলাম বলে আপনার হাতে না থাকলে বিব্রত হবার দরকার নেই। আমি তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবো না।^{১১} নজরুলের অনেক পত্রাবলীই এমন কষ্টের পাণ্ডুলিপি। ব্রজহারী বর্মনকে লিখেছেন; মুরলীধর বসু, খান মঈনুদ্দিনকে লিখেছেন - নিজের স্বাস্থ্যের অবনতি ও অর্থকষ্টের তাড়নার কথা। সবার চেষ্টা ও সহযোগিতার কমতি ছিল না - প্রতিভাধর কবিকে বাঁচানোর জন্য সবাই অন্তর ছোঁয়া তাগিদ অনুভব করত। সত্যিকার অর্থে এমন উদ্ভঙ্গমুখর রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সময়ে কোন কিছুই স্থিতিশীল ছিল না, কেউই স্থির ও নমনীয় জীবনে ফিরতে পারছিল না। কবি খান মঈনুদ্দিন লিখেছেন - 'আমাদের কারুরই অবস্থা ভাল ছিল না। 'নিত্যভিক্ষা তনুরক্ষা' অবস্থা। আমরা নজরুলের কথা ভাবতাম- তাঁর আর্থিক দুর্গতির কথা ভাবতাম। কি করে তাঁর আর্থিক সমস্যার সমাধান করা যায়, এই নিয়ে গবেষণা করতাম।^{১২}

সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে নজরুল মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে। আবার সাহিত্য করেও অনেকেই নজরুলের বিরোধীতা করেছিলেন - সওগাতকে অনেক প্রতিকূলতার মাঝে কাজ করতে হয়েছে। ভুক্তভোগী নজরুল পত্রাবলীতে এ প্রতিকূলতা ও পক্ষপাত মেনে নিয়েই বলেছেন 'সমাজ তো হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ সেবা হয়ত চলবে না।^{১৩} নজরুল আরো জানতেন, 'কবি হওয়ার মত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আর নেই যারা ফুল ফোটায় তাদের মাথাই সবচেয়ে অ-নিরাপদ।^{১৪} এ পত্রগুলো সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে নজরুলের প্রতিক্রিয়া সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত আলাপেই সমাজের প্রতি তাঁর

নজরুলের চিঠিপত্র

খেদোক্তি করে পড়েছে। অনেক জায়গায় তার তীব্রতা প্রকট। হিন্দু-মুসলমান ধর্মের আঁচড়ে কবি যখন খন্ডিত হয়েছেন, নিজ ধর্মের মানুষ যখন তাঁকে 'কাফের' বলেছে তখন তীব্রভাবে তাঁর বাণী তিনি সমাজে প্রেরণ করেছেন। ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৯২ আনুওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্রে সুস্পষ্ট বলেছেন তিনি—

মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু আমি দুঃখ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ, বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানেরা ঈর্ষাপরায়ণ। এ আমি একটুও বানিয়ে বলছি। মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান – কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, মুসলমান-কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি।^{১৫}

মুসলমানদের প্রতিই নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গী খুব বেশী সজাগ ছিল। মুসলমানদের সচেতন করা, সত্যিকার সাহিত্যচর্চার পথে দৃষ্টিদান; নানা সময়ে তাঁর কবিতা-গল্প-উপন্যাসে সে ছাপ তিনি রেখেছেন। পত্রাবলীতেও সে প্রকটত্ব এতটুকু কমেনি অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর পত্রের জবাবে তিনি লিখেছেন—

আপনার 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয়ত। ওর মনে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিম-ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্যরচনা চলতে পারে কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি: গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সামান্যধিকারবাদ।^{১৬}

বিভিন্ন সময়ের সূত্র ধরে নজরুলের চিঠিপত্রে আমরা যেমন সমাজের নানারকমের চরিত্র পাই তেমনি সমাজ সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ের সাথে ব্যক্তি নজরুলের একটা নীতিগত দৃষ্টিও নজরে পড়ে। ব্যক্তি নজরুলের প্রেমিক হৃদয়; প্রেমতৃষ্ণাতুর মন নানাভাবে তাঁর সাথে জড়িয়ে যায়। চট্টগ্রামের বাহার নাহারের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল স্নেহাতুর ও শ্রদ্ধায় দীর্ণ। নজরুল পত্রে লিখেছেন 'কী যে করছ তোমরা দু'টি ভাই-বোনে যে এসে অবধি মনে হচ্ছে যেন কোথায় কোন নিকটতম আত্মীয়কে আমি ছেড়ে এসেছি। মনে সর্বদা একটা বেদনার উদ্বেগ লেগেই রয়েছে। অদ্ভুত রহস্যভরা এই মানুষের মন! রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যাব, সে-ই কখন পথের সম্বন্ধকে সকল হৃদয় দিয়ে অসংকোচে স্বীকার

সাহিত্যিকী

করে নেয়।^{১৭} কবি মনের এ চিঠি নজরুলের। সমাজের ঔচিত্যবোধের পরামর্শ আছে, নারী-স্বাধীনতার কথা আছে, আছে কবিদের কাব্যলক্ষীর আরাধনার পাথেয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত। ‘সরস্বতীর শতদলের আরাধনা’র প্রকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি চিঠিতে। কবির উচ্ছ্বাসের চিঠি কাজী মোতাহার হোসেনের নিকট লিখিত। নজরুল প্রেমে পড়েছিলেন ফজিলাতুন্নেসার। সংকলিত চিঠিপত্রের অনেকাংশেই (কাজী সাহেবের মাধ্যমে) তার স্বাক্ষর আছে। ‘প্রথম দর্শনেই নজরুল ফজিলাতুন্নেসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গড়েন। কিন্তু ফজিলাতুন্নেসা তখন এ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। নজরুল নানাভাবে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ফজিলাতুন্নেসা ধরা না দেওয়ায় তিনি বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনকে তাঁর মনের কথা জানান।^{১৮} ফজিলাতুন্নেসা নজরুলকে অশ্রদ্ধা করেননি। বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শী জ্ঞানে তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাছাড়া এটা স্পষ্ট তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, নজরুলের সাথে তার সম্পর্ক হলে তা অনর্থই ডেকে আনবে। নজরুল হা-হতাশ করে মোতাহার হোসেনকে লেখেন— ‘বড্ড ‘শক’ পেয়েছি কাল ও’র চিঠি পড়ে। শরীর মন দুই অসুস্থ বলে হয়ত এতটা লাগল।... তবে ঐ এক চিঠি পেয়েই যতটা বুঝেছি— আমার তিনি দ্বিতীয় চিঠি পেয়ে দয়া করবেন না।.... আচ্ছা বন্ধু এত শক্ত মনের পুরুষ তার কান্না পায় আমার এতটুকু অবহেলায়, আর একজন নারী— হোক না সে পাষণ্ড প্রতিমা— তার কিছু হয় না।^{১৯} মোতাহার হোসেনের কাছে লেখা নজরুলের অধিকাংশ পত্রই আবেগ-উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন। নজরুল মনের কথা বলতে পেরেছিলেন তাঁকে— একান্ত আপনজনের মতো। ১৯২৮ সালে ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে কাজী মোতাহার হোসেনের আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নজরুল এমন বন্ধুকে খুব কাছের করে পেয়েছিলেন। সওগাত অফিস থেকে লেখা চিঠিপত্রে গণিতশাস্ত্রের পাশাপাশি একজন বোদ্ধা সাহিত্যরসিক হিসেবেও জেনেছিলেন তাঁকে নজরুল। ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম সাহিত্য সমাজের নানপর্যায়ের লেখকগোষ্ঠীর সাথে খুব স্বাভাবিকভাবে নজরুলের আত্মা জড়িয়ে যায় : জসীম উদ্দীন, আবদুল কাদির, আব্বাস উদ্দীন প্রত্যেকের সাথে নজরুল চিঠিপত্রে মতবিনিময় করেন। তাঁদের সান্নিধ্য ছিল অত্যন্ত গভীর। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে নজরুল নিজের পারিবারিক জীবনের কথা যেমন বলতেন তেমনি নিজের বাউন্ডেলে স্বভাবের আত্মসমালোচনাও করতেন।

নজরুল প্রতিভার পরিণতির কারণ চিঠিপত্রগুলো পঠনে স্পষ্ট হয়। ১৯৩০-র পরে নজরুল সমাজ রাজনীতি থেকে অনেকটা ওটিয়ে নিয়েছেন। কাব্যলক্ষী ছেড়েছে তাঁকে। ২৮.৮, ১৯৩৫-এ কবি রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন— ‘আমার ওপর হয়ত প্রসন্ন কাব্যলক্ষী হিজ

নজরুলের চিঠিপত্র

মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের ভয়ে আমায় ত্যাগ করেছে বহুদিন। কাজেই সাহিত্যের আসর থেকে আমি প্রায় স্বৈচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছি। '২০ এর কারণ অনেকটা অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও পুত্র বুলবুলের মৃত্যু। অর্থনীতি ও অধ্যাত্মবাদ দু'টোই ভর করেছে তাঁর ওপর। 'ব্যবসায়ীরা যখন তার সামনে তুলে ধরলেন তাঁদের অর্থের খলি, গানের ভিতরে পেলেন মনের ঘোরাঙ্ক; তখন তিনি হারিয়ে ফেললেন নিজের সূক্ষ্ম বিবেচনাশক্তি। সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন নিজের কাছে।' ২১

বেপরোয়া জীবনে নজরুল কখনও সুস্থ শিল্পচর্চা করতে পারেননি। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গণে ঝড়ের মতো এসেছিলেন তিনি। তাঁর ঝড়ো জীবনযাপন যৌবনময় ভাবনা আর সৃজনশীলতার দাপটে সর্বত্র বইয়ে গিয়েছিল তাজা হাওয়া। এক্ষেত্রে নিজেও বিস্মৃত হয়েছেন। চিঠিপত্রগুলোর মধ্যে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। কখনো সাধু কখনো চলিত ভাষায় নিজস্ব ভঙ্গীতে লিখেছেন তিনি। বিষয় অনুযায়ী ভাবের প্রবাহ চমৎকার সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাষায় যেমন মসৃণ বিনীত ভাব পরিলক্ষিত তেমনি যুক্তির তান্ডবও বহুমাত্রিক। আবেগ-সংঘমে তাঁর চিঠিপত্র শিল্পে ভিন্নমাত্রা এনেছে। কবির মনন এর সাথে সুগ্রন্থিত। সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বিরহে নজরুলের চিঠিপত্রগুলো তাঁর সমগ্র জীবনকে ধরেছে, নির্মিত করেছে একটি সময়ের একজন শিল্পী চরিত্রকে। সামগ্রিক নজরুলকে জানার জন্য এসব চিঠিপত্রের গুরুত্ব একেবারেই কম নয়, আর গবেষণার ক্ষেত্রে তো বটেই।

তথ্যনির্দেশ

১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), 'নজরুল-রচনাবলী' (পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।
২. শাহাবুদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), 'নজরুলের পত্রাবলী', নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), "বাঁধন-হারা", 'নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪৯৩।
৪. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), নজরুল রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ), পৃ. ৩২০।
৫. তদেব, পৃ. ৩২২।
৬. তদেব, পৃ. ২৪৯।
৭. কবীর চৌধুরী, 'নজরুল দর্শন', নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৪৮।
৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', এম. সি. সরকার আদ্যত সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ২৬।
৯. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), নজরুল-রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ), পৃ. ২৪৭।

সাহিত্যিকী

১০. তদেব, পৃ. ২৪২।
১১. তদেব, পৃ. ২৬৩।
১২. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, 'যুগ-স্রষ্টা নজরুল', আলহামরা লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১০১।
১৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), নজরুল রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ), পৃ. ২৮০।
১৪. তদেব, পৃ. ২৬৬।
১৫. তদেব, পৃ. ২৪৮।
১৬. তদেব, পৃ. ২৮৪।
১৭. তদেব, পৃ. ২৫২।
১৮. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, 'সঙগাত-যুগে নজরুল ইসলাম', নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৫৯।
১৯. তদেব, পৃ. ২৬৪।
২০. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), নজরুল-রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ), পৃ. ৩২৫
২১. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, 'যুগ-স্রষ্টা নজরুল', পৃ. ১৮৫-৮৬।